

জীবনের প্রজ্ঞাপাঠ

মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ



গার্ডিয়ান

পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

চিন্তা করা, চিন্তা গড়া	৯
মনোজগৎ ও মনোবিজ্ঞানী	১৩
ভাবনার ভাঁজে ভাঁজে	১৮
জানার ব্যগ্রতা	২০
আত্মবিশ্বাস, বিশ্বাসের আত্মা	২৩
বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর	২৮
কেমন তারুণ্য চাই	৩১
সুপারম্যান	৩৪
বিজয়ের জন্য	৩৬
দূরত্ব বজায় রেখে চলা	৩৯
কষ্টের পরে নয়; কষ্টের সাথেই স্বস্তি	৪২
দুই খরগোশের পেছনে দৌড়াতে নেই	৪৬
ধৈর্যই ধন, ধৈর্যই বীরত্ব	৪৮
অসার চাকচিক্য	৫১
ভুল স্বীকার পরিশীলনের সদর দরজা	৫৩
ভুল স্বীকারের ‘রেওয়াজ’ করি	৫৫
একটু ঝাঁজ, একটু ‘ফাকজি মা আনতা কাজ’	৫৮
দুটি পা বা দুটি ক্রাচ	৬১
বুদ্ধিতে হয় সিংহ বধ	৬৪
প্রেমের শক্তি, প্রেমের সৌন্দর্য	৬৮
ভালোবাসার বীজ	৭২
অঙ্কুর থেকে শিক্ষা	৭৫
পাষাণে পেষণ, মেহেদি পাতার রং	৭৭
শক্তিশালী প্রচারমাধ্যম	৮০
সম্প্রীতি অর্জিত সম্পদ নয়, স্রষ্টার দান	৮২
ঝরনার প্রবাহ নিজেই পথ করে নেয়	৮৪
সাধারণ ব্যর্থতায় অসাধারণ সাফল্য	৮৭
সৌন্দর্যময় কোমল সাক্ষাৎ	৮৯
অপেক্ষার প্রহর, অপেক্ষার প্রহরা	৯২

না সমালোচনা, না সমগ্রতায়	৯৫
চিবুক টেনে একটু 'দুষ্টমি' করুন	৯৭
কষ্টের বদলায় পুরস্কার দিন	৯৯
বন্ধুত্বের স্নিগ্ধ বন্ধন	১০৪
একটুখানি বলতে জানা	১০৬
একটু অনুতাপ, নিমিষেই মোছে পাপ	১১০
স্বাধীন, কিন্তু কতটুকু স্বাধীন	১১৩
ইতিহাসকে স্মরণ করা	১১৬
দারিদ্র্যও শক্তি	১১৯
মানুষে যেন মূলের কথা মনে রাখে	১২২
পোকামাকড় এড়িয়ে চলুন	১২৫
আত্মহনন নয়; আত্মজাগরণ	১২৯
সুযোগ থাকলে কর্জ দিন	১৩১
মিষ্টি-মধুর কুশলী আচরণ	১৩৩
নেতৃত্ব ধন নয়, ভারী দায়িত্ব	১৩৬
দাওয়াতের ভাষা ও অধিকার আদায়	১৩৮
পরীক্ষায় পরিশীলন, পরীক্ষাও পুরস্কার	১৪২
অসুস্থ হলে পাশে একটি বই রাখুন	১৪৫
প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত থাকতে নীতিকবিতা	১৪৯
পড়ুন	
মানুষের জীবনে বৃক্ষের ধ্রুবপাঠ	১৫৩
পানাহ চাই, সূচনায় সমাপ্তিতে	১৫৮

চিন্তা করা, চিন্তা গড়া

চিন্তা শুধু করলে হয় না; চিন্তা গড়তেও হয়।

চিন্তা গড়া মানে নিজের মানসিকতাকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলা, যাতে চারপাশের সবকিছু থেকে শিক্ষা অর্জন করা সম্ভব হয়। চারপাশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার মেজাজ ও রুচি একদিকে যেমন মানুষের চিন্তানৈতিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে, তেমনি মানসিক অবসাদ থেকে তাকে দেয় নিস্তার, প্রতিভাজগৎকে দেয় বিস্তার।

চিন্তাশীল ও চিন্তক মানুষটি হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে দিলের জানালার বাইরে দৃষ্টিটা একটু মেলে ধরে বলেই বাইরের রং-জগৎ তার ভেতরে প্রবেশ করে। তার বুকের অনেকটা জায়গাজুড়ে শুধু রং আর রং; সাদা, সবুজ, হলুদ, আকাশি। সৎ চিন্তাশীল ব্যক্তির প্রসন্ন চোখ-মুখ দেখে মনে হয় সোনালি যুগের একখানা জলরঙা ছবি। তার স্বপ্নীল চাহনি যেন চাঁদের আসরে গেয়ে ওঠে সরস কাহিনির মধু মধু গান।

প্রত্যেক মানুষকে নিজের চিন্তাশক্তির ব্যাপারে হতে হয় জাগ্রতমস্তিষ্ক। চিন্তাশক্তিকে করতে হয় সর্বোচ্চ শানিত-তেজ। আর এভাবে ক্রমান্বয়ে নিজের চিন্তা বিশুদ্ধ হয়, হয় ঋদ্ধ ও পরিপুষ্ট। বিশুদ্ধ চিন্তার ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয় সুমহান কর্মের সুউচ্চ প্রাসাদ। চিন্তা শুদ্ধ হলে কর্মের যাত্রা হয় সঠিক ও গন্তব্যমুখী। গন্তব্যমুখী যাত্রাই একমাত্র পথিককে নিয়ে যেতে পারে আখেরি মনজিলের সোনালি সোপানে।

সমস্ত সমস্যা প্রথমে সৃষ্টি হয় মানুষের মন ও মননে। তাই মানুষ চাইলে তাকে মনের ভেতরেই সমাধি দিতে পারে। তবে এ জন্য দরকার অসাধারণ চিন্তাশক্তি। চিন্তাশক্তি সঞ্চয়ের জন্য দরকার চিন্তার সঠিক শীলন ও অনুশীলন। চিন্তার শুদ্ধি ও সমৃদ্ধির নিজিতে মেপেই বলা যায় একজন মানুষ কতটুকু সম্পন্ন, কতটুকু সম্পূর্ণ।

পৃথিবীতে কিছু কিছু মানুষ আছে, যাদের থাকে রাশি রাশি আবিরের মতো সূর্যসঙ্কাস চিন্তাশক্তি। বাজের মতো তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চায় জীবনগ্রন্থের সবকিছু বা অনেক কিছু। এমন চিন্তাশক্তির চর্চা উদ্দীপনায় চাঙিয়ে তুলতে পারে সমস্ত অন্তরাত্মা—নিজের ও পরের।

চিন্তাগড়া বা সৃষ্টিশীল চিন্তাশক্তির কারণে যে একটি মামুলি বিষয়ও অসাধারণ অনন্যতা পায়, তা তুলে ধরতে দু-চারটি অণুগল্প ও ইতিহাসখণ্ডের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। একাত্ম-অন্বেষী মন নিয়ে পড়ে দেখুন, কেমন লাগে।

নবিদের প্রজ্ঞাদৃষ্টির একটি দীপ্তিমান দিক হলো, তারা ‘না’কে ‘হ্যাঁ’র মতো করে দেখতে জানেন। কারণ, প্রভুর এ পৃথিবীতে কোনো বিষয়ই নিষ্ঠুর পর্যায়ে সম্ভাবনাহীন নয়। সব অসম্ভবের ভেতরও ক্ষীণ সম্ভাব্যতা লুকিয়ে থাকে। লুকিয়ে থাকা জিনিসটা দেখার জন্য যে তীক্ষ্ণদৃষ্টি-দীপ্তি দরকার, তা নবিদের থাকে পর্যাণ্ডরকম। এজন্যই তারা দেখেন।

মক্কা থেকে তায়েফ যাওয়ার পথে নবিজি একটি দুর্গম সরু পাহাড়ি পথ অতিক্রম করছিলেন। তিনি সাথীদের জিজ্ঞাসা করলেন—‘এ পথের নাম কী?’ তারা বলল—‘আজ জয়্যিকাহ’ (অর্থ : মুশকিল)। তিনি বললেন—‘না না; বরং তার নাম “আল-ইউসরা” (অর্থ : সহজ)।’^১

কী চমৎকার চিন্তাভঙ্গি দেখুন তো! মুহূর্তেই তিনি ‘নেতি’কে ‘ইতি’ দিয়ে পরিবর্তন করে দিলেন। সফর-ক্লান্তির যন্ত্রণাবোধকে ঝরঝরে হালকা করে তোলার জন্য তিনি মিষ্টি চালে বললেন—পথ কীভাবে কঠিন-দুর্গম হয়? মুসাফিরের পথ তো হবে সহজ-স্নিগ্ধ-সুগম।

শফিক বালখি (মৃত, ১৯৪ হি.) ও ইবরাহিম বিন আদহাম (মৃত, ১৬২ হি.) ছিলেন সামসময়িক ব্যক্তি। শফিক বালখি একজন বিখ্যাত দুনিয়াবিমুখ সুফি। ইবরাহিম বিন আদহাম বিশাল বাদশাহি ছেড়ে দরবেশি অবলম্বনকারী একজন ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তিত্ব। বয়সে ও অভিজ্ঞতায় বড়ো ছিলেন ইবরাহিম বিন আদহাম। অনুজ শফিক বালখি তাকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন।

একবার এক বাণিজ্য সফরে বের হচ্ছিলেন শফিক বালখি। তার আগে একটু সাক্ষাৎ করতে এলেন অগ্রজ ইবরাহিম বিন আদহামের সঙ্গে। সাক্ষাতের অল্প কদিনের মধ্যে বালখিকে মসজিদে দেখতে পেয়ে ইবরাহিম আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন—‘এত অল্প সময়ে আপনি সফর থেকে ফিরে এলেন?’ বালখি বললেন, আমি তো সফরেই যাইনি! কিন্তু কেন? প্রশ্নের উত্তরে বালখি খুলে বললেন তার দেখা রোমঞ্চের ঘটনাটি—

‘কিছু দূর গিয়ে যেখানে পৌঁছাই, তা ছিল নিতান্ত অনাবাদি জায়গা। জন নেই, প্রাণী নেই। ধু-ধু মরু, খাঁখাঁ বালিয়াড়ি। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাত নেমে এলো। আমি শিবির স্থাপন করলাম। তখন একটি চড়ুই নজরে পড়ল। খুব দুর্বল, উড়ালশক্তিহীন। তার প্রতি আমার খুব মায়া হলো। চোখ-মন ভিজে এলো হঠাৎই। খুব ভাললাম—এমন বিরান ভূমিতে এমন দুর্বল চড়ুইটি খাবার কীভাবে পাবে, বাঁচবে কীভাবে? ভাবনার ভাঁজটা চেহারা থেকে মুছে যাওয়ার আগেই দেখি, আরেক চড়ুই এসে উপস্থিত। ঠোঁটে শক্ত করে চেপে আছে কিছু জিনিস। পঙ্গু চড়ুইটির পাশে আসার সাথে সাথেই ঠোঁটের জিনিসগুলো পড়ে গেল টুপ করে। অমনি পঙ্গু চড়ুইটি তা উঠিয়ে খেয়ে নিল। তারপর উড়ে গেল সুস্থ-সবল চড়ুইটি।

এ দৃশ্য দেখে উচ্চৈঃস্বরে বললাম—“সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ যদি বিরান ভূমিতে পড়ে থাকা একটি পঙ্গু পাখিকে এভাবে রিজিক দিতে পারেন, তাহলে আমার মতো মানুষ কেন দেশ থেকে দেশান্তর চেষ্টা বেড়াবে?” এ ভাবনার ভেতর আচ্ছন্ন হয়ে ফিরে এলাম।’

ঘটনা শুনে ইবরাহিম বিন আদহাম বললেন—‘শফিক! তুমি পঙ্গু পাখির মতো হতে চাইলে কেন? তুমি তো চাইলে সে পাখি হতে পারবে, যে বাহুশক্তি ব্যয় করে নিজেও খায়, অপরকেও

^১ ইবনে ইসহাক

খাওয়ায়।’ এ কথা শোনার সাথে সাথে শফিক বালখি ইবরাহিমের হাতে চুমু খেয়ে বললেন—‘আবু ইসহাক! আপনি আমার চোখের মোটা পর্দা সরিয়ে দিয়েছেন। আপনি যা বলেছেন, তা-ই সত্য, বিধিবদ্ধ ও প্রজ্ঞাময়।’

একই ঘটনা থেকে একজন নিলেন সাহসের সবক, আরেকজন হীনম্মন্যতার বা অযৌক্তিক তাওয়াক্কুলের। একেই বলে চিন্তার সার, চিন্তার ধার।

আরবি সাহিত্যে হাস্যরসাত্মক গল্পের একটি প্রসিদ্ধ চরিত্র আছে—নাম জুহা। তাকে ঘিরে কথিত আছে নানান মজার মজার গল্প। তারই একটা গল্প বলছি, যা আমাদের চিন্তাকে টনটন উত্তেজনায় চাঙা করে তুলবে।

বন্ধুদের মধ্যে তর্ক চলছে। বিষয়—পৃথিবীর সবচেয়ে দামি বস্তু কী? এমন তুঙ্গস্পর্শী তুমুল তর্কে জুহার নীরবতা দেখে বন্ধুরা অবাক! একজন বলল— ‘জুহা! তুমি তো পণ্ডিত মানুষ। বিতর্কিত বিষয়ে তুমি যে কিছুই বলছ না? একটু মুখটা খোলো, দোস্ত!’

জুহা নিঃসংকোচে জবাব দিলো—‘উপদেশকেই আমি পৃথিবীর সবচেয়ে দামি বস্তু মনে করি।’

বন্ধুরা এ উত্তর নিয়ে চিন্তা করল। আরেক বন্ধু সকৌতুহলে—‘তাহলে কোন বস্তুটিকে পৃথিবীতে মূল্যহীন মনে করো তুমি?’ ‘আমি মনে করি—উপদেশই সেই বস্তু, পৃথিবীতে যার এক পয়সারও মূল্য নেই!’ বলল জুহা।

এবার বন্ধুদের চেহারা যুটে উঠল অনন্য এক বিস্ময়। একজন হেসে জিজ্ঞেস করল—‘জুহা! এ তুমি নিশ্চয়ই রসিকতা করছ! কিছুক্ষণ আগেই তো বললে, উপদেশই পৃথিবীর সবচেয়ে দামি বস্তু। আর এখন বলছ, এর এক পয়সারও মূল্য নেই। একই বস্তু মূল্যবান ও মূল্যহীন হয় কীভাবে?’

জুহা বলল—‘বিষয়টি নিয়ে তুমি যদি প্রজ্ঞার সাথে ভেবে দেখো, তবে বুঝতে পারবে, আমি রসিকতা করছি না; বরং নিরেট সত্যটাই বলছি। যখন তুমি কোনো ব্যক্তিকে উপদেশ দেবে এবং তদানুযায়ী সে আমল করবে, তখন তোমার উপদেশটা পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান ও দামি বস্তু হবে। আর তুমি কাউকে উপদেশ দিলে, কিন্তু সে তা গ্রহণ করল না, তাহলে সেই উপদেশের এক পয়সারও মূল্য নেই! তাকে উপদেশ দেওয়া না দেওয়া বরাবর।’

বস্তুনিষ্ঠ চিন্তার মাধ্যমে মানুষ এভাবে একটি বস্তুর নানা কৌণিকতা খুঁজে বের করতে পারে। বড়ো অদ্ভুত মানুষের চিন্তার কারিগরি, ভাবনার কারুকাজ!

আমরা বঞ্চনা চাই না; চাই সফলতা। আমরা চাই আলোয় ভরা ভুবন, জোছনায় ভরা আকাশ। চিন্তার সূর্যালোকে স্নাত হলেই আমরা হতে পারি পরিচ্ছন্ন, পরিশুদ্ধ। সাফল্যের গোলাপি সুষমায় ভরে উঠুক আগামী স্বপ্নশানিত জীবন!

মনোজগৎ ও মনোবিজ্ঞানী

‘দুশ্চিন্তা বার্ষিক্যকে ত্বরান্বিত করে।’^২

এই বাণীর নিচে যদি পশ্চিমা কোনো বিজ্ঞানী বা দার্শনিকে নাম লেখা থাকে, তাহলে অনেকে শিহরিত শব্দে ‘ওয়াও, ওয়াও’ করে উঠবে। কী দারুণ সত্য কথা! এমন করে যে তারা বলতে পারেন! যদি বলি, এ বাণী ডেল কার্নেগি, রবিন শর্মা, এপিজে আবদুল কালামের কিংবা কোনো নামকরা মনোবিজ্ঞানীর, তাহলে সবাই বলবে—অসাধারণ তো! এজন্যই তো তাদের বই মিলিয়ন মিলিয়ন বিক্রি হয়। নিখাদ মুগ্ধতায় তাদের প্রশংসা করবে। নিজেদের ভুবনে তাদের স্বাগত জানাবে।

কিন্তু যদি বলি—এটি হাদিসের বাণী, তখন কী করবে জানেন? দ্রুত ভগ্নিত বলবে—‘ও! কোনো ওয়াজে মনে হয় শুনেছিলাম। অবাস্তব ‘পরমুগ্ধতা’ ভিন্নরূপের মতো আমাদের হেঁকে ধরেছে। ঘরের সম্পদ হাতের কাছে ঢের পড়ে আছে। একটু হাত বাড়ালেই আঁচলভরে নিতে পারব, কিন্তু ওগুলোকে মনে হয় খুব সস্তা, খড়কুটোর স্তূপ।

দুশ্চিন্তা মানুষকে কুরে কুরে খেয়ে শেষ করে, ত্বরান্বিত করে বার্ষিক্যকে—সে কথা আজ ছোটো-বড়ো সবাই জানে। দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য কত প্রকল্প, কত বই-পুস্তক, কত ক্লিনিক, কত কত মনোবিজ্ঞানের কোর্স! কত কাঠখড় পোড়ানো! দুশ্চিন্তা মানুষকে বুড়িয়ে দেয়—এ কথা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের আবিষ্কার বা থিউরি নয়। আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে বলে দিয়ে গেছেন শান্তির অগ্রদূত মুহাম্মাদ (সা.)। সেই সঙ্গে দুঃখ ও দুশ্চিন্তা কেন এবং কীভাবে সৃষ্টি হয়? সেটাও বাতলে দিয়েছেন—দুনিয়ার প্রতি অতি আগ্রহ দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দেয়।^৩

সুন্দর-স্বর্গীয়-শান্তিময় একটি জগৎ ও মনোজগৎ রচনার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন আমাদের প্রিয় রাসূল (সা.)। সেই প্রেরণ-লক্ষ্যের স্বভাবদাবি ছিল—তিনি একজন দক্ষ মনোবিজ্ঞানীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। কারণ, প্রতিটি মানুষের চেহারা-সুরত যেমন ভিন্ন, তেমনিভাবে তাদের চিন্তাধারা ও অনুভব-অনুভূতিও ভিন্ন। আরও ভিন্নতর তাদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা। ফলে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা ও মানসিকতার মানুষকে একই ধর্মের অভিন্ন শিবিরে সমবেত করতে হলে, তাদের মানসিকতা ও

^২. আল-মাকাহিদুল হাসানা, আল্লামা সাখাভি

^৩. বায়হাকি, মুসনাদে আহমদ

হৃদয়ের রহস্যলোকের গতিবিধি বোঝা অপরিহার্য ছিল। ফলে তাকে সে যোগ্যতা দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল।

সত্যস্পন্দিত ইতিহাসের দিকে একটু ফিরে তাকালেই আমরা দেখতে পাব— আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে সর্বমুখী শান্তি ও কল্যাণের দূত মহানবি (সা.) বহু মনস্তাত্ত্বিক সূত্রের বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন নিজের জীবনে, তাঁর সঙ্গীদের জীবনে।

‘দাঁড়ানো অবস্থায় কারও মাথায় রাগ চাপলে তাড়াতাড়ি বসে যাও। তাতেও রাগ প্রশমিত না হলে শুয়ে যাও।’^৪

রাগ সংবরণের কী অদ্ভুত মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা দেখুন! রাগ প্রশমের সাথে বসা ও শোয়ার কী সম্পর্ক? আপনি কি এখন ‘বাহ বাহ’ করে উঠবেন?

রাগের মাথায় মানুষ আজ কী-না করে বসছে! খুন-গুম থেকে শুরু করে ইতিহাসের ঘৃণ্যতম সব অপরাধই তো করে বসছে। রাগ সংবরণ করার কলাকৌশল বিষয়ে আজকের তথাকথিত মনোবিজ্ঞান কতই-না থিউরি ঝাড়ছে, অথচ মানবদরদি নবিজি সেই কবে বাতলে দিয়েছেন! আরেক হাদিসে আছে— ‘রাগ করা শয়তানের অভ্যাস। শয়তান আগুনের সৃষ্টি। আগুন নিভে পানি দ্বারা। সুতরাং কারও যদি রাগ ওঠে, তাহলে সে যেন অজু করে নেয়।’^৫

এ হাদিসদ্বয়ে রাসূল (সা.) রাগের মতো একটি মারাত্মক খারাপ ব্যাধির চমৎকার মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা বাতলে দিয়েছেন।

নতুন নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্ভব ও আবিষ্কারের জোয়ার-স্ফীত যুগে, মনোবিজ্ঞান একটি গবেষণামুখরিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। মনোবিজ্ঞান আজ মানবজীবন থেকে দুঃখের সব গ্লানি মুছে দিয়ে নিরঙ্কুশ শান্তির শামিয়ানা প্রসারিত করছে বলে মনোবিজ্ঞানীরা দাবি করেন। মনোবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা-রচনা-গ্রন্থনা হয়েছে নানাভাবে, নানান আঙ্গিকে। এ বিজ্ঞান মানব-মনের গহিন-গভীর রহস্যলোক উন্মোচিত করেছে বলে অহংকার করে সংশ্লিষ্ট গবেষক ও রচয়িতাগণ। ইসলামবিদেষ্টা পশ্চিমারা তো নির্দিধায় বলবে—এটা তাদেরই আবিষ্কার। এ সবুজাভ প্রান্তরে তাদেরই প্রথম পদপাত। অথচ আধুনিক মনোবিজ্ঞান থিউরির জোয়ার তো বইয়ে দিয়েছে, কিন্তু মূল সমস্যার সঠিক সমাধান দিতে সক্ষম হয়নি। এমন কোনো দিকনির্দেশনা দিতে পারেনি, যা অনুসরণ করলে সত্যি দুঃখিতামুক্ত-সুন্দর-সুখময় একটি সমাজ গড়া যায়, হীনম্মন্যতায় দিশেহারা যুবকশ্রেণিকে নতুন জীবনে উদ্দীপ্ত করা যায় এবং ছোট শিশু-কিশোরদের গড়ে তোলা যায় যোগ্যতর কর্মোদ্যমী সূনাগরিক হিসেবে।

মনোবিজ্ঞানের অন্যতম নীতি হলো—মানুষের মনে বিরাজমান হীনম্মন্যতাকে দূরীভূত করে তার স্থলে অটুট মনোবল ও সাহস দিয়ে ভরে দেওয়া, যাতে সে সহজে পতনোন্মুখ-পচনশীল মানসিকতা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। মানুষের ভেতর হীনম্মন্যতা সৃষ্টির পেছনে যে কারণটি সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল তা হলো—ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে বর্ণ-বংশের ভেদাভেদ এবং

^৪ . সহিহ বুখারি ও মুসলিম

^৫ . সুনানে আবু দাউদ

শ্রেষ্ঠতাত্ত্বিক মতভেদ। এ বিশ্বংসী ভেদ ও মতভেদকে সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য নবি (সা.) পুরো জীবন তো নিরন্তর চেষ্টা-সাধনা করেছেন-ই, ওপরন্তু বিদায় হজের ভাষণে সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—‘তোমরা সকলে মাটির তৈরি আদমসন্তান। সুতরাং আরব-অনারব হওয়া এবং সাদা-কালো হওয়ার ভিত্তিতে পরস্পরের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব যা আছে, তা একমাত্র তাকওয়ার ভিত্তিতে।’^৬

মানুষের উঁচুনিচু মানসিকতা, মহত্ত্ববোধ ও অধমত্ববোধ সৃষ্টির পেছনে দানবৃত্তি ও ভিক্ষাবৃত্তির যে অমোচ্য প্রভাব ক্রিয়াশীল, তার প্রতি ইঙ্গিত করে দানবীর নবি মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন—‘নিজের হাত উঁচু রাখা নিচে রাখার চেয়ে উত্তম।’^৭ অর্থাৎ হাত নিচে রেখে ভিক্ষকের আদলে নিজেকে উপস্থাপন করার কারণে নিজের ভেতর নীচুতা ও হীনম্মন্যতা সৃষ্টি হয়। আর নিজের হাতকে ওপরে রেখে দানবীরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে উঁচু মানসিকতা ও মহত্ত্ববোধ জাগ্রত হয়।

মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সজীব-সুখময় করার জন্য রাসূলের সিরাত একটি উত্তম আদর্শ। শরীর ও আত্মার সর্বপ্রকার আরোগ্যের জন্যও রাসূলের সিরাতে রয়েছে উন্নত ও উত্তম চিকিৎসা। শরীরের সুস্বাস্থ্য ও শক্তি, আত্মার পরিচ্ছন্নতা ও মুক্তি, মস্তিষ্কের পেলবতা ও সুতীক্ষ্ণতা, ইচ্ছা-প্রতিজ্ঞার পরিমার্জন এবং অবদানের অনবদ্যতা ও মহত্ত্ব ইত্যাকার সবকিছুই রাসূলের আদর্শের অপরিহার্য ফলাফল। রাসূলের শিক্ষাদীক্ষা মানার মধ্যে শারীরিক ও আত্মিক উপকার ছাড়াও মনস্তাত্ত্বিক আরোগ্যেরও বিশাল এক প্রভাব রয়েছে।

সৃষ্টিগতভাবে মানুষ আল্লাহর কুদরতের একটি শাহি নিদর্শন। কোনো কিছু নিয়ে ভাবা, কোনো কিছুর তাৎপর্য অনুধাবন করা, সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং চারপাশের পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার একটি শক্তি ও যোগ্যতা রয়েছে মানুষের ভেতর। মানুষ ভালো পরিবেশে বড়ো হলে এবং সঠিক নির্দেশনা পেলে সুকৃতির অধিকারী হয়। পক্ষান্তরে খারাপ পরিবেশে বড়ো হলে এবং ভুল নির্দেশনায় চালিত হলে নিশ্চয়ই ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট হয়। জড়িয়ে পড়ে নানা অপরাধে, অপকর্মে।

আল্লাহর রাসূল তা ভালো করেই বুঝতেন এবং বুঝতেন বলেই ব্যক্তির মানসলোকের অবস্থা বুঝে উত্তর ও সমাধান প্রদান করতেন। এজন্য দেখতে পাই—কখনো কখনো রাসূল (সা.) একই প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্নজনকে বিভিন্নভাবে উত্তর দিয়েছেন। যেমন :

তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো—‘হে আল্লাহর রাসূল! কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম?’ তিনি উত্তর দিলেন—‘আল্লাহ ও রাসূলের ওপর ঈমান আনা, অতঃপর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা, তারপর হজ করা।’^৮

আরেকবার জিজ্ঞাসা করা হলো—‘হে আল্লাহর রাসূল! কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম?’ তিনি উত্তর দিলেন—‘আল্লাহর ওপর ঈমান আনা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।’^৯

^৬ মুসনাদে আহমদ

^৭ সহিহ বুখারি-মুসলিম

^৮ সহিহ বুখারি ও মুসলিম

^৯ প্রাগুক্ত

একই বিষয়ে আরেকবার জিজ্ঞাসা করা হলো—‘হে আল্লাহর রাসূল! কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম?’ তিনি উত্তর দিলেন—‘ঠিক সময়ে নামাজ আদায় করা এবং মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করা।’^{১০}

দেখা যাচ্ছে, একই প্রশ্নের উত্তর রাসূল (সা.) এক-একজনকে এক-একভাবে দিয়েছেন। এ ভিন্নতার কারণ কী? হাদিসবিশারদগণ বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু একটি ব্যাখ্যায় সকলে একমত—রাসূল (সা.) প্রশ্নকারীর মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা বুঝেই ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দিয়েছেন।

সুন্দর একটি মনোজগৎ রচনার জন্য এবং গতিময় চিন্তাশক্তি বিকাশের জন্য তিনি উম্মতকে দিয়ে গেছেন অসংখ্য আলোকিত চিকিৎসা ও পথনির্দেশ।

ভাবনার ভাঁজে ভাঁজে

একজন বলল—‘সন্ধ্যা নেমে এলো।’

আরেকজন বলল—‘এই তো সকাল ফুটবে।’

একজন বলল—‘আজকের দিনটা পুরাই নষ্ট হয়ে গেল।’

আরেকজন বলল—‘আগামীকাল তো এখনও নষ্ট হয়নি।’

সরল কটি বাক্যের ভেতর জমা আছে জীবনসাফল্যের অনেক কিছুই। এটাই হলো চিন্তা—শিল্পিত চিন্তা। আপনি যদি কোনো বিষয়কে বর্তমানের দৃষ্টিতে দেখেন, তাহলে চোখের সামনে ছোপ ছোপ আঁধারিই দেখবেন। আর যদি সুন্দর আগামীর দৃষ্টিতে দেখেন, তাহলে আকাশে শুধু জ্বলজ্বলে নক্ষত্রই দেখবেন।

অধিকাংশ মানুষের দৃষ্টি থাকে ‘আজ’র ওপর। ফলে আজকের অবস্থা যদি ভালো না যায়, তারা ভেঙে পড়ে। মনে করে, জীবনটাই শেষ। হায় হায় শব্দে বিষাক্ত করে তোলে চারপাশ। কালকে যে উঠে দাঁড়ানোর অব্যবহিত সম্ভাবনা পড়ে আছে, সেদিকে দৃষ্টি যায় না; মানুষের দৃষ্টি বড় অলস।

জমিন ঘুরছে। ঘুরছে মানুষের জীবন-চাকা। ‘আজ’ গেল। ‘বর্তমান’ও যায় যায়। সম্ভাবনাময় ‘আগামী’ তো আছে। নির্বোধের দৃষ্টি থাকে পেছনের দিকে। বুদ্ধিমানের দৃষ্টি থাকে সামনের দিকে। চিন্তাশীল ব্যক্তি ভাবতে থাকে, সুন্দর-স্বপ্নময় আগামীটা আসুক হাতের মুঠোয়।

বুদ্ধিমানদের ভাবনা সত্যিই অন্যকরম। তাদের ভাবনার ভাঁজে ভাঁজে ছড়িয়ে থাকে এগিয়ে যাওয়ার মন্ত্র, বিকাশের ব্যাকরণ।

চিন্তা-সৌন্দর্যের আরেক দেদীপ্যমান দিগন্ত হলো চিন্তার ইতিবাচকীকরণ। আরেকটু ঝাঁজ দিয়ে বললে—নেতিবাচক চিন্তারও ইতিবাচকীকরণ। চিন্তার ইতিবাচকতা উত্তম রক্তকেও পানি করে দিতে পারে।

একটি গল্প বলছি। স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) ছিলেন হিন্দু সন্ন্যাসী, দার্শনিক লেখক। সংক্ষেপে তিনি ছিলেন হিন্দুদের একজন পূজনীয় ব্যক্তি। তার ছিল একজন চতুর খ্রিষ্টান বন্ধু। উভয়ের মাঝে ছিল গভীর সখ্য। তাদের মাঝে জীবন বদলের নানা ব্যাকরণ নিয়ে আলাপ হতো। খ্রিষ্টান বন্ধু একদিন তাকে নিজ বাড়িতে খাবারের নিমন্ত্রণ জানালেন।

স্বামী উপস্থিত হলেন যথাসময়ে। ড্রয়িংরুমে তার বসার ব্যবস্থা হলো। রুমে বইয়ের এক বড়ো টেবিল। স্তূপ স্তূপ বই। একটি স্তূপ অনেক উঁচু, যেন ক্ষুদ্রে হিমালয়ের দৃশ্য। ধর্মীয় বইয়ের স্তূপ সেটি। সেখানে ‘গীতা’ রাখা হয়েছে সবগুলো বইয়ের নিচে—যেন অপমানে ঝলসিয়ে-দেওয়া এক দগদগে বিদ্রূপ।

গ্রন্থস্তুপের দিকে ইঙ্গিত করে বিবেকানন্দকে জিজ্ঞাসা করা হলো—‘বলুন তো এ বিন্যাস আপনার কেমন লাগছে?’

জিজ্ঞাসা নয় যেন বিদ্রূপের বিস্ফোরিত বারুদ। এখন একজন হিন্দু পণ্ডিতের প্রতিক্রিয়া কী হবে বলে আমরা ভাবতে পারি? হতে পারত, হিন্দু মেহমান তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বলতেন,

‘আমাকে অপমান করার জন্য বুঝি নেমন্তন্ন করেছেন। আমার সামনেই নিজ ধর্মগ্রন্থের অপমান করে আমার হৃদয়ে আপনি বিষ ঢেলে দিলেন।’ এবার মেজবানে-মেহমানে গুরু হত তুমুল হুংকার, হাতাহাতি বা আরও মারাত্মক কিছু।

কিন্তু বিবেকানন্দ সেটাকে নেতিবাচকভাবে নেননি। সংযমী বুদ্ধিমত্তার পলিশ দিয়ে পরিস্থিতিকে ঘুরিয়ে দিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে। তিনি একটু মুচকি হেসে শীতল স্বরে বললেন—‘জি বন্ধু! ফাউন্ডেশন বড়ো মজবুত ও মহান হয়েছে।’

কী চমৎকার ইতিবাচকতা দেখুন তো! যে জিনিস নিচে থাকে, সেটা ফাউন্ডেশন হয়, ভিত্তি হয়। ভিত্তি বড়ো ও মজবুত হলেই তো অন্য সবকিছু মজবুত হবে। নিচে রাখাকে তিনি ভিত্তির সাথে উপমায়িত করে তার ধর্মগ্রন্থের মর্যাদাকেই স্মুরিত করে তুললেন। ফলে যেখানে হঠাৎই ঘৃণার আগুন জ্বলে উঠতে পারত, সেখানে তিনি ইতিবাচকতার মাধ্যমে শীতল পানীয় সৃষ্টি করেছেন।

মানুষের জীবনকে বলা হয় শিল্প। যে ব্যক্তি এ শিল্প যতটুকু বোঝে, সে ততটুকুই সফল জীবন নির্মাণ করতে পারে। আর যে ব্যক্তি এ শিল্প সম্পর্কে অনবগত, পার্থিব জীবনে তার ভাগ্যলিপিই হলো ব্যর্থতা আর বঞ্চনা।

জানার ব্যথতা

‘ডাবল মূৰ্খতা’ বলে একটা কথা আছে আরবি ভাষায়, যার অর্থ—একে তো মূৰ্খ, আবার নিজের অজ্ঞতা সম্পর্কেও অজ্ঞ। ফলে সে অজ্ঞতার আঁধার ছেড়ে আলোর পথে আসতে পারে না। মানুষের জীবনে এ এক চরম বাস্তবতা। কথাটার আরেকটা ব্যাখ্যা হতে পারে—জ্ঞান আছে, তবে তার আচরণে-উচ্চারণে বোঝা যায় না, তার জ্ঞান আছে। জ্ঞান তার জীবনের কোনো অঙ্গনে আলো ফেলতে পারেনি; মশালধারী অন্ধের মতো।

দীর্ঘ শিক্ষকজীবনে অভিজ্ঞতার গোলায় উঠে এসেছে নানা শস্য। বারবার লক্ষ করেছি, পাঠ্যবইয়ের বাইরে জীবন-জগৎ সম্পর্কে ছাত্রদের কোনো প্রশ্ন করলে তারা এই-ওই ইতিউতি করে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছে। খুব কম ছাত্র পাওয়া যায়, যারা স্পষ্ট বলে দেয়—‘উস্তাদ! আমি জানি না।’ উত্তর দেওয়ার চেষ্টার করা খারাপ না। তবে জ্ঞান ফলানোর চেষ্টা অতিশয় মূৰ্খতাক্রিষ্ট, মারাত্মক।

আরবিতে একটা প্রবাদ আছে—‘লা আদরি নিসফুল ইলম।’ অর্থাৎ জানি না কথাটা জ্ঞানের অর্ধেক। এটা মূলত সাহাবিদের বাণী।^{১১} মর্মার্থ-মহত্বের ফলে প্রবাদে পরিণত হয়েছে। এই ‘জানি না’-ই ছিল নবুয়তের সূচনাবাক্য। সাহাবিদের জীবনের অনেক কিছু জানার ভরসা ছিল এ বাক্যটি। রাসূল তাদের নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তারা উত্তর দিতেন—‘আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।’

মানুষের জীবনে ‘স্প্রিট অব ইনকোয়ারি’—জানার ব্যথতা বা অনুসন্ধিৎসা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জ্ঞানের গুরুটা হয় নিজের অজ্ঞতাকে জানার মাধ্যমে।

মানুষ যখন নিজের অজ্ঞতাকে জানে, নিজের ভেতরে অজ্ঞতার অন্ধকার আছে তা অনুভব করে, তখন তার মধ্যে জানার ব্যথতা সৃষ্টি হয়। তখন সে জানার মানসে প্রত্যেকটি বস্তু নিয়ে গভীরভাবে ভাবে, জানার চেষ্টা করে। বিপরীতে যার মধ্যে নিজের অজ্ঞতার খবর নেই, সে জানার চেষ্টা করে না। অজ্ঞতার অন্ধকারে পড়ে থাকে; ফোটে না চোখে জ্ঞানের আলো।

এই যে আজকের বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের চোখ ঝলসানো সৃষ্টি, অবাক করা অবদান; এর পেছনে একটা চিন্তা কাজ করেছে—‘স্প্রিট অব ইনকোয়ারি’।

বর্তমানে মানুষ পৃথিবী ও প্রকৃতি সম্পর্কে যে অগণিত তথ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, তার কারণ স্প্রিট অব ইনকোয়ারি। পৃথিবীর এই বস্তুরাজি আগেও ছিল, কিন্তু তখন মানুষের মধ্যে ছিল

^{১১} শা’বি, সুনানে দারিমি

না স্প্রিট অব ইনকোয়ারি অথবা বলতে পারি, সুযোগ ছিল না। তাই তারা অনেক কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই মেনে নিত। আর এই অনুসন্ধিৎসাহীনতা তাদের বস্তুর রহস্য উদ্ঘাটনে প্রতিবন্ধক ছিল।

আর এখন মানুষ প্রতিটি বস্তুর রহস্য উদ্ঘাটন করতে চায়। এরই নাম স্প্রিট অব ইনকোয়ারি। এই স্পৃহা মানুষকে দিয়েছে রাজ্য জ্ঞান ও তথ্য। সংগত কারণে, যেকোনো ক্ষেত্রে উন্নতি করতে চাইলে অবশ্যই স্প্রিট অব ইনকোয়ারি থাকতে হবে। এটি যার যত বেশি থাকবে, সে তত বেশি জানতে পারবে এবং তার উন্নতি ও অগ্রগতি তত বেশি হবে।

বর্তমান যুগকে বলা হয় তথ্যের যুগ—এইজ অব ইনফরমেশন। এখন তথ্যের সীমানা বিশাল, বিস্তৃত। তাই এখন স্প্রিট অব ইনকোয়ারি আরও বেশি জরুরি। আগের যুগে মানুষ অল্প চেষ্টায় অনেক পেয়ে যেত। আর এখন অনেক চেষ্টার পর পায় অল্প। এই অবস্থায় নিজের তথ্যভান্ডারকে সমৃদ্ধ করা অতীব জরুরি। পর্যাপ্ত তথ্যভান্ডার না থাকলে বর্তমান সময়ে উন্নতি লাভ করা অসম্ভব।

জানার এ ব্যগ্রতা থেকে কত কিছুই-না হয়েছে পৃথিবীতে! ক্ষুদ্র একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ফল গাছ থেকে ছিঁড়ে গেলে নিচে পড়ে যায়; ওপরের দিকে যায় না। শতাব্দীর পর শতাব্দী এ রকমই হয়ে আসছে। মানুষ মনে করেছে, এটা সাধারণ একটি বিষয়। প্রকৃতির স্বাভাবিক চাকায় চলেই চলছে। ঘাম ঝরিয়ে জানার কী আছে এখানে? যা হচ্ছে হয়ে আসছে; হতে থাকবে।

কিন্তু একজন ব্যক্তি ঠিকই চিন্তা করলেন। তিনি নিউটন (১৬৪৩-১৭২৭)। বিশ্বের প্রখ্যাত প্রভাবশালী বিজ্ঞানী। তিনি জানার চেষ্টা করলেন। তিনি চিন্তা করলেন—ফল নিচে পড়ে কেন, ওপরের দিকে যায় না কেন? এটি ছিল একটি অভিনব চিন্তা। জানার ব্যগ্রতায় স্নায়ুতন্ত্রে তাঁর আগুন লেগে যায়। রোমাঞ্চে, স্বপ্নে, সাধনায় জারিত হয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন—জমিনে একপ্রকার আকর্ষণশক্তি রয়েছে, যার ফলে ওপরের জিনিস নিচের দিকে চলে আসে। নিচের জিনিস ওপরে ওঠে না।

অবশ্যই মাধ্যাকর্ষণের কথা ভিন্ন। সেটিও আবিষ্কৃত সত্য। যা-ই হোক, জানার ব্যগ্রতাই আমাদের হাতে তুলে দিতে পারে বিচিত্র জ্ঞানের রাজ্য।